IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

অস্তিত্বের বিপন্ন বাস্তবতার বয়ান : মলয়কান্তি দে'র নির্বাচিত গল্প

(The Narrative of the Perilous Reality of Existence: Selected Stories of Malaykanti Dey)

শঙ্কু ভূষণ লস্কর
গবেষক,বাংলাবিভাগ,আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:
The Barak Valley is one of the prominent hubs of literary activity in the northeastern region. Through the cycles of historical erosion, decline, construction, and reconstruction, the society, literature, and culture of this region have carved out a unique identity for themselves.
In contemporary times, Moloykanti Dey stands out as an exceptional storyteller in the northeastern literary landscape. His stories are both truthful and profoundly introspective. Amidst the entanglements of state and politics, people like Ashraf Ali, trapped under labels such as "citizenship," "illegal," and "D-voter," struggle to find a homeland. Women crushed under the weight of religion, politics, and patriarchy discover themselves reduced to mere objects. Workers unquestioningly accept subjugation, while ordinary people confront the dark quicksand of life. In such bleak circumstances, Moloykanti crafts a counter-narrative that captures the stark truths of these vulnerable lives.
The paper is analytical in nature construed with the help of primary and secondary data.

Key words- Asraf Ali Swadesh, Manusanghita, Komola Ranger sarre,

---

''Had there been no partition , there would not have been any 'foreigner issue' in Assam''
-Sujit chudhury

বিশ শতকে বাংলা গল্পের বিষয়,আঙ্গিক ও প্রকরণের ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তনের যে নতুনত্ব সূচিত হয়েছিল তা বরাক উপত্যকার গল্পভুবনকে স্পর্ষ করলেও তার অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্যকে ছাড়িয়ে তা বাস্তুচ্যুত হতে চায়নি। পরিবর্তিত সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি ত্রিবিধ ক্ষেত্রে বহুমুখী টানাপোড়ন ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে এ উপত্যকার সাহিত্য এক নিজস্ব পরিসর তৈরি করে নিয়েছিল। তাই তপোধীর ভট্টাচার্য থেকে শেখর দাশ, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, রণবীর পুরকায়স্থ, অরিজিৎ চৌধুরী,শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, কান্তারভূষণ নন্দী প্রমুখের রচনার এক এক নিজস্ব মনন ও যাপন, সময় ও সমাজ, রাজনীতি ও সংকটের বহুস্বর প্রতিফলিত হতে দেখেছি।
উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা বরাক উপত্যকার একজন ব্যতিক্রমী কথাকার মলয়কান্তি দে। তাঁর জন্ম দেশভাগে বাস্তুচ্যুত এক পরিবারে। যে ভূখণ্ড তাঁকে ধাত্রীর মতো আশ্রয় দিয়েছে তার নাম করিমগঞ্জ। খণ্ডিত ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! দু পা অতিক্রম করলেই স্বদেশ অথচ নিজ দেশে পরবাসীজন।১৯৪৭ এর নির্মিত সীমারেখা লক্ষ লক্ষ মানুষের অস্তিত্ব ও শেকড়ে যে বল্লমবিদ্ধ পাপের জন্ম দিয়েছিল সেদিনকার বাঙালি সমাজ এবং তার উত্তর প্রজন্ম এই কৃষ্ণগহ্বর থেকে এখনো মুক্তি পায়নি। স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দাবাখেলায় ব্রিটিশেরা

যেভাবে বাঙালি জাতির মেরুদণ্ডকে দুর্বল করার জন্য বিভাজন রেখা তৈরী করেছিল, বাঙালি জাতি তার কিছুই অনুধাবন করতে পারেনি।আর বাঙালির মধ্যে যারা অনুধাবন করতে পেরেছিল তার এক অংশ যেমন কেন্দ্রের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছিল অন্য অংশ তেমনি ব্যক্তিস্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে উপেক্ষা করেছিল।

ঔপনিবেশিক কর্তারা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগাম বার্তা দিতেই সর্বভারতীয় স্তরে ক্ষমতায়ান নিয়ে নোংরা রাজনীতির যে সূত্রপাত হয়েছিল তাতে হিন্দু ও মুসলমান পরিচয়কে প্রকটতর করলেও আসলে দুটো ক্ষমতাকামী গোষ্ঠীর বলির শিকার হয়েছিল মদমত্ত সাধারণ দরিদ্র মানুষ। যে দ্বিজাতিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে দেশভাগ হয়েছিল তার মাত্র কয়েকবছরের ব্যবধানে ধর্মের নিগড়ে বাঁধা দেশ নামক কাল্পনিক সত্যকে চুরমার করে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি আসলে বাঙালি জাতিসত্বার পরিচয় নির্মাণ করেছিল।

১৯৪৭ এ সিলেট গণভোটকে কেন্দ্র করে আসামের বাঙালির জীবনে যে ক্ষত তৈরী করা হয়েছিল স্বাধীনতার এতো বছর পরেও তা থেকে উত্তরণের কোন পথ নির্মিত হয়নি। বরং রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্রের পাহাড়াদারদের হাতে এন.আর.সি, অবৈধ, ডি-ভোটার, সিটিজেনশিপ, মাইগ্রেশন ইত্যাদি ঘোষিত অভিধায় সাধারণ মানুষকে বারবার নিগৃহীত করা হয়েছে। মলয়কান্তি দে'র 'আসরাফ আলীর স্বদেশ গল্পটি ৪৭ এর দেশভাগের প্রেক্ষাপটে শুরু হলেও এর বিস্তার ঘটেছে দেশভাগ উত্তরকালীন দুই প্রজন্মের সংকট ও বিপন্ন অস্তিত্বের দহনীয় বাস্তবতায়।

দেশভাগের ফলে আধিপত্যপ্রবণ শক্তির কাছে আসরাফের বা-জান নিজের সাত পুরুষের ভিটেমাটি হারিয়ে বেঁচে থাকার জন্য ভারতবর্ষের করিমগঞ্জে চলে আসে। দু -কদম অতিক্রম করলেই নিজ স্বদেশ সিলেট । নবগঠিত পূর্ববঙ্গ। রাষ্ট্রের সামান্য সীমারেখায় দেশ নামক ভূখণ্ড নির্ধারিত হয়ে গেলেও মানুষের ঠিকানা তখনো স্থায়ী হয়নি। একটা পতিত জমি বসবাসের যোগ্য করতে গিয়ে সাপের ছোঁবলে বা-জান মারা যান। এক প্রজন্মের কথা এখানে শেষ হলেও দেশভাগের উত্তর প্রজন্মের কথা শুরু হচ্ছে এক অন্ধকার রাতে পুলিশ ভ্যানে এগারোজন মানুষ যেমন পাইকারি হাঁটে গরুছাগল হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমত অবস্থায়। এই এগারোজনের মধ্যে আসরাফ স্ত্রী সন্তান সমেত বাংলাদেশি তকমায় অভিযুক্ত হওয়ায় সরকার রক্ষীদের হাতে বন্দী। কোন এক অনির্দিষ্ট নির্বাসন তার জন্য অপেক্ষৃত। কেননা আসরাফের কাছে না আছে বাংলাদেশ না আছে ভারতবর্ষ।

দেশভাগের ফলে প্রব্রজন উত্তরকালে আসামের বহিরাগত সমস্যা কেন্দ্র করে গল্পটি একটি শ্রেণির বিপন্নতা ও অসহায়তা এবং নো ম্যান- একটা নন এনটিটির বাস্তবতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। ' সিটিজেনশিফ, মাইগ্রেশন' এই দুটি শব্দের রাজনীতিতে কত কত মানুষ শেষ হয়ে যায়। তখন মনে হয় এই মানুষগুলি জন্ম নিয়েই পাপ করেছে কারণ এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান-

"ফুটপাথে কিংবা রেলের প্ল্যাটফর্মে ভিড় বাড়ায়। আর স্বপ্ন দেখে দেশ, ঘর, জমি, ফসল।"[১]

এই অবস্থানের থেকেও আর এক ভয়ংকর বাস্তবতার কথাও লেখক আমাদের জানিয়ে দেন এভাবে- "বিশ্বাস করা যায় না জানেন! আমরা কাঠ কুড়াতে জঙ্গলে যাই। এখানে ওখানে ছেঁড়া কাপড়, রক্ত, একদিন দেখলাম উদোম ন্যাংটো একটি মরা মেয়েমানুষ, বুক থেকে শেয়ালে খুবলে নিয়ে গেছে মাংস।"[২]

তবুও এই মৃত্যু,অন্ধকার, গন্তব্যহীন যাত্রার মধ্য দিয়ে আসরাফদের স্বদেশ নামক ভূখণ্ডের খোঁজ অব্যাহত থাকে। উত্তর ঔপনিবেশিক সময় পর্বেও নাগরিকত্ব, উদ্বাস্তু, শরণার্তী নামক চিহ্নকে আসরাফদের মতো মানুষকেই বহন করতে হয় কেননা ক্ষমতা আর সত্যের নির্মাণ তাদের কাছে থাকে না। তাই মিশেল ফুকোর মত চিন্তাবিদরা যুক্তি দিয়েছিলেন-'truth is not merely a reflection of reality but is produced through power relations and social practices' ক্ষমতা ও সত্যের অবস্থান থেকে দূরে মধ্যরাতের বিপর্যস্ত জঙ্গলের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা আফসারদের অবস্থানকে তাই লেখক অনুমান করে নেন এভাবে-

"এখানে দাঁড়িয়ে আসরাফ বুঝতে পারছে-পৃথিবীর কোথাও তার কোনও স্বদেশ নেই। পাকিস্তানে তার স্বদেশ কেড়েছে ইরফান চাচা, হিন্দুস্থানে কাদের মিঞা। স্বদেশ এখন তাদের মুঠোয়। আর আসরাফ? নো ম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে আসরাফ আসলে এখন নো ম্যান্-একটা নন্ এন্টিটি।"[৩]

তবুও তারা স্বদেশ নামক ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখে, যাত্রা অব্যাহত রাখে। কখনো ইরফান চাচা, কখনো কাদের মিঞা, কখনো বা রাজনৈতিক স্বার্থ আসরাফদের জীবনকে নিয়ে পুতুল নাচ খেলে আর ভূমিকার পর ভূমিকার

বদলে অন্য এক বিপন্নতার আখ্যান তৈরী হয়। বর্তমান সময়েও উত্তরপূর্বাঞ্চলের জনজীবনে এই বিপন্নতা বার বার তাড়িত করে চলেছে।

।। দুই।।

মলয়কান্তি দে'র গল্পের একটি বিশিষ্ট দিক হচ্ছে সহজ ও সাধারণ ঘটনাকে তিনি জীবনের বহুকৌণিক টানা পোড়নের সঙ্গে মিশিয়ে উপস্থাপন করতে পারা। একটি সধারণ জীবনও যে সহজভাবে অতিক্রম হয় না, তার মধ্যেও অনেক ক্ষত, ঘাত- প্রতিঘাত, মানসিক বিপর্যয়, নৈতিক ও সামাজিক বিপন্নতা থাকে মলয়কান্তির গল্পে সেটা সূক্ষ্ম অথচ গভীরভাবে প্রতিফলিত হতে আমরা দেখেছি। 'কমলা রঙের শাড়ি' গল্পটির নামকরণ খুব স্বাভাবিক হলেও গল্পটির ভেতর রয়েছে আরো একটি উত্তর-গল্পের নির্মাণ। সাধারণ শ্রমিক জীবনের কর্মহীনতা, রোজগারের অনিশ্চয়তা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা জগদীশ নামক চরিত্রকে যেভাবে একা নি:সঙ্গ করে দিয়েছে সে ব্যর্থতা শুধু জগদীশের নয়, জগদীশ নামক এই শ্রণীকেই ত লেখক এখানে নির্বাচন করেছেন। নব্য আধুনিকতার অর্থলোলুপ দৃষ্টিকোণ যেভাবে জীবন থেকে সহজতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়, আর সেখানে যদি পরিবারে প্রধান পুরুষ বেকার হয় তাহলে পরিবার, স্ত্রী, সন্তানের প্রতি তার খবর নেওয়া একপ্রকার নৈতিকতা বিরুদ্ধ। আসলে পরিবর্তিত সময়ে সবকিছুর মূল্য যেন অর্থের উপর নির্ভরশীল। তবুও জগদীশ এক মিথ্যা সম্পর্ককে অবলম্বন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। এই বেঁচে থাকা, মিথ্যা অবলম্বন, অস্তিত্বের বিপন্নতার মাঝখানে আরো একটি নতুন গল্পের নির্মাণ পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয়ে যায়। আর এখানেই মলয়কান্তির অনন্যতা।

'কমলা রঙের শাড়ি' গল্পে স্ত্রী ফুলমণির শাড়িটি জগদীশের চোখের সামনে জলকাদায় পড়ে আছে অথচ জগদীশ সেটা তুলতে গিয়েও চাপা ক্রুরতার সহিত নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। গল্পকার জগদীশের এই চাপা ক্রুরতা ও বিরক্তির কিছু বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু যেটুকু বোঝার কথা সবই যেন পাঠকের জেনে নিতে হবে। চারপাশে পরিবর্তিত জীবন যেন জগদীশের মতো মানুষের কাছে অন্য মানে তৈরী করে দেয়। এয়ারপোর্ট, ওরিয়েণ্টাল কোম্পানির স্টোনক্রাশিং মেশিন ইত্যাদিকে ঘিরে ঝোপঝাড়ের জাগয়াটিতে যখন লোকের ভিড় লেগে গেল। আশে পাশের চা বাগানের ছাঁটাই করা শ্রমিক মেয়েদের দিয়ে কাজ করানোর মধ্যেও এক প্রকার বঞ্চনা ও শোষনের রাজনীতির প্রতি লেখক ইঙ্গিত করেছেন। গল্পকারের ভাষায়-

''বাগানের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের হাজিরা ছেলেদের চেয়ে কম। কোম্পানিও সেই রীতি বহাল রেখে বেশি করে মেয়েদেরই নিয়োগ করল। শ্রমিক সংগঠন নেই। আন্দোলন নেই। এমনকি পাথরভাঙা ধুলোয় লোকের ঘরদোর, রোদে শুকোতে দেওয়া কাপড়-চোপড়ে পুরু আস্তরণ পড়ে গেলেও চোখ রাঙাতে এল না কোনও পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড।''[৪]

উত্তর পূর্বাঞ্চলের চা শ্রমিকের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে ক্ষমতাতন্ত্রের বাস্তবতাকে লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের ইতিহাস খুঁজলে আমরা দেখতে পাই ন্যায় ও প্রাপ্য দাবীতে শ্রমিকেরা শহিদ হয়েছিল কিন্তু আধুনিক সময়ে কি শ্রমিকেরা তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে? কখনোই তারা সেটা পারে নি। বরং একটা গোপন ও নিরব অত্যাচার তাদের প্রতিদিনের সঙ্গী।কাজের তুলনায় পারিশ্রমিক যেমন কম তেমনি একটা অকল্পনীয় জীবন যাপনে তারা বাধ্য।

ফুলমণি কাজ পেয়ে গেল কোম্পানিতে। অন্তত মাস ছয়েকের স্থায়িত্ব। এই স্থায়ীত্বটুকু ফুলমণির জন্য কম নয়। কেননা বাগানের কাজে তাকে একপেটা আধপেটা খেয়ে আয়ুক্ষয় করতে হয়েছে। জগদীশের চৌদ্দ বছরের ছেলেটাও যখন বাবুদের ক্যাম্পে ফাইফরমাস খাটার কাজ পেয়ে যায় জগদীশ তখন তৃপ্তই ছিল। তৃপ্ত থাকারই ত কথা। কেননা এই ত প্রথাগত সামাজিক নিয়ম। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে জগদীশের চিন্তার অনেক দূরত্ব রয়ে গেছে। ফুলমণি নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে অন্য এক বিহারি মজুর পুরুষের সঙ্গে।তার জীবনে জগদীশের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেও চলে। কিন্তু কেন এই বিপর্যয়? পাঠক হিসেবে আমরা বলতেই পারি যে, প্রেম নয় , শারিরীক চাহিদা নয়, একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম হিসেবেই ফুলমণি এ পথে যেতে বাধ্য হয়েছে। জগদীশ টের পায় কোম্পানির কাছে সে হেরে যাচ্ছে । স্ত্রী'কেও হারিয়েছে, পুত্রকেও হাতছাড়া হতে দেখেছে। তবুও এক বিপন্ন মানসিকতায় নিজেকে একজন কাল্পনিক স্বামী, এক সন্তানের দায়িত্ববান পিতা

হিসেবে বেঁচে থাকার অবস্থান তৈরী করতে চেয়েছে। আর এটাই হচ্ছে মানুষের অস্তিত্ব আর বিপন্নতার সংকট। যদিও কোন অর্থ নেই, তবুও একটা অর্থ বানিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।তাই- ‘‘জলে কাদায় নোংরা হয়ে আছে শাড়ি। জগদীশ তুলে রাখে। নোংরা ত ধুলেই চলে যায়’’[৫] এভাবেই মানিয়েই তাকে জীবন কাটাতে হবে।

।। তিন।।

‘‘ patriarchy has no interest in your happiness, your well-being, or your ability to live an interesting life- only your obedience.’’

-Rebecca Solnit

এমনকি সাম্প্রতিক সময়েও প্রচলিত একটি শব্দ হচ্ছে দাঙ্গা।পরিচিত অর্থে ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে হিংসাত্মক আক্রমণকেই আমরা দাঙ্গা হিসেবে বিবেচনা করি। কিন্তু গল্পকার মলয়কান্তি দে' তাঁর 'মনুসংহিতা' গল্পে 'দাঙ্গা' শব্দটির অর্থকে প্রগতিশীল অর্ন্তদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন।তিনি দাঙ্গার সঙ্গে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষমতাকামী স্বার্থের সংঘাত,এক অন্ধ, নিষ্ঠুর,মদমত্ততা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ দাঙ্গার বেলায় ধর্ম, সম্প্রদায়,ভাষা, সংস্কৃতির পরিচয় একেবারে অর্থহীন। দাঙ্গাবাজ মানেই অপরাধী। কেননা সে মনুষ্যত্ব নামক কথাটিকে কলঙ্কিত করে। এই গল্পটি দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা হলেও গল্পটির প্রধান লক্ষ নারী/ মেয়ে নামক লিঙ্গ পরিচিতির বিপন্নতাকে প্রতিফলিত করা। যেকোন দাঙ্গার সময়ে যে বর্বরতম ঘটনাটি ঘটে সেটা হচ্ছে মেয়েদের ধর্ষণ। কেননা এই সমাজ মেয়েদের এখনো সম্পদ হিসেবেই গণ্য করে। আর সম্পদের বিনষ্টিতে দাঙ্গাবাজরা এক বর্বরতম উল্লাসে মেতে উঠে। তাই এই আধুনিক পৃথিবীতে আমরা এই নৃসংস চিত্রকে দেখে বার বার লজ্জা ও ঘৃণায় ব্যথিত হই।

আজকাল আমরা একটি শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সেটা হচ্ছে ‘Femenism’ বাংলায় যাকে বলে 'নারীবাদ'। তাত্ত্বিক অর্থে নারীর অবস্থান, পরিচিতি, অধিকার,প্রাপ্য, ইত্যাদি বিষয়ই নারীবাদের মূল বিষয়। কিন্তু যে সমাজ আজও আকণ্ঠ ডুবে আছে শতাব্দী প্রাচীন পুরুষের তৈরী কোন না কোন ধর্মগ্রন্থের মোহজালে সে সমাজ কীভাবে নারীকে মুক্তি দেবে? একদিকে যেখানে তার মনোজগত সেইসব প্রাচীন গ্রন্থনির্মিত অন্যদিকে সে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তার মনোজগতকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই ত শত শত নারী শুধু বংশ রক্ষার দায়ভারে বিফল হয়ে হতাশা ও আত্মহত্যার পথকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। কেন এই হতাশা বা আত্মহত্যা, তার মূল খুঁজতে হবে শতাব্দী প্রাচীন সেই অমোঘ বিধিনিষেধের মধ্যে। যেখানে শাস্ত্র নারীকে বিধান দেওয়া হয়েছে পুরুষের সেবা, আতিথেয়তা ও সন্তানধারণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয় পুরুষের নামে।

আধুনিক সময়ে 'মনুসংহিতা' শব্দটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় নারী এবং স্ত্রীদের প্রতি এর নিষ্টুর ও নির্বিচার বিধিনিষেধর কথা, নারীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা। গল্পকার খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে ‘মনুসংহিতা’ গল্পে প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন।

ছেলে সন্তান জন্ম দিতে না পারলে যেকোন নারীর জীবনে স্বামী, পরিবার, পরিজনের কাছে যে লাঞ্চনা ও গঞ্জনার শিকার হতে হয় এই একুশ শতকে দাঁড়িয়েও আমরা তার সাথে পরিচিত। কেননা একমাত্র পুত্র সন্তানই বংশকে বিস্তার ও রক্ষা করার মান্যতা ও অধিকার পেয়েছে। কিন্তু যে নারী সেই বংশকে ধারণ করবে পুরুষতন্ত্র নামক ক্ষমতা তাকে নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করেছে। আধুনিক সময়ে এই উপেক্ষা ও অধিকারবোধ নারীর মননে যতই জাগ্রত হচ্ছে পুরুষতন্ত্রকেও আমরা ততো শক্ত হতে দেখেছি। যেমন ধরে নাও, একটি নারীর ধর্ষণের পিছনে অনেকে দায়ী করে তার পোশাককে, তার একা চলাকে, ধর্মীয় পোশাক পরিধান নিয়ে নারীকে হত্যা করার ঘটনা কম নয়। নারী যতই শিক্ষিত হোক পুরুষতন্ত্র নামক প্রতিষ্ঠান তাকে অবদমন করতে চায় ই চায়।

এই গল্পে দাঙ্গা বর্ণনার পাশাপাশি একটি পরিবারের বর্ণনা রয়েছে। বড় মেয়েটির জন্মের পর আরো দুটি মেয়ে জন্ম হওয়াতে স্বামী,শাশুড়ি, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শির কম লাঞ্চনা গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি মেয়েটির মাকে। তারপর যখন পরিবারে দুটি পুত্র সন্তান এসেছে তখনই এই লাঞ্চনা গঞ্জনার হাত থেকে মা রক্ষে পেয়েছেন। একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে মেয়েটি স্কুলে ভর্তি হয়েছে, কলেজে পড়বে কী না তার নিশ্চয়তা নেই, কারণ পড়াশুনা করিয়ে লাভ কী? সেই ত বিয়ে দিতেই হবে। পনেরো ষোল বছরের মেয়ের চোখে যখন

মেঘ খেলা করল, তখন মেয়েটি যদি বাইরে গিয়ে কলংক রটায়, তাহলে বংশের মান নিয়ে টান পড়বে। এই পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছে দাঙ্গা। মেয়েটিরা বাবা যখন অনুমান করে নেন পরবর্তী দাঙ্গার আক্রমণ তার ঘরে। তখন তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। সেই রাতেই ভাই ও মাকে ডেকে পরামর্শে বসলেন তিনি এবং ঠিক করলেন- " ছেলে দুটোকে তৈরী করে দাও।আজ রাতেই ওদের পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবো বাইরে কোথাও।''[৬] মা তখনই জানতে চাইলেন শুধু ছেলেকে পাঠানো কেন? এর উত্তরে আমরা যে বাক্যকে শুনতে পেয়েছি ''ছেলে দুটো যাক। আমরা যদি কাটা পড়ি, বংশটা তো বেঁচে থাকবে।...মেয়েটার কী হল তার আমি কী জানি? বংশটা তো বেঁচে গেল।''[৭]

এখানেই সম্পূর্ণ গল্পের মর্মভেদ করে বেড়িয়ে এসেছে পুরুষতন্ত্রের নির্দয় বাস্তবতা। নারীর প্রতি পুরুষের এক অমানবিক উপেক্ষা। এই আধুনিক সময়েও নারী কি তার নিজস্ব পরিসর তৈরী করতে পেরেছে? নিজস্ব জীবনবোধ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে বাঁচত সক্ষম হয়েছে? এর উত্তর খুবই জটিল ও অবস্থান সাপেক্ষ। তাই নারীকে নিজ দায়িত্বে বুঝতে হবে, তৈরী করে নিতে হবে নিজস্ব পরিচয় ও অবস্থান। যে অবস্থান থেকে মুক্তি নেওয়াই আধুনিক নারীর একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান সময়ে মলয়কান্তি দের গল্পের পুন:পাঠ নানাভাবে প্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয়েছে। বহিরাগত, ডি-ভোটার, সিটিজেনশিপকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষকে যেভাবে আক্রান্ত হতে হয়েছে তার থেকে এখনো কোন মুক্তির পথ সূচিত হয়নি বরং সময়ে সময়ে নতুনভাবে এর বিষজ্বালায় মানুষকে দগ্ধ হতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে কী হবে তা এখনো জানা নেই। ঔদ্যোগীকরণকে কেন্দ্র করে শ্রমিক জীবনের বিবর্তিত শোষণ ও বঞ্চনার যে নতুন অধ্যায় তৈরী হচ্ছে একজন চিন্তাশীল মানুষকে তা ভাবতে বাধ্য করে। পুরুষতন্ত্র কীভাবে নারীর জীবনের নির্ধারণ করে দেয়, নারীর অস্তিত্ব ও পরিচয়কে নিজ স্বার্থে নির্মাণ করে আধুনিক সময়েও তার অজস্র উদাহরণ তুলে ধরা যায়। মলয়কান্তি দে'র তাঁর গল্পে এই বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র, রাজনীতি,সমাজ, ধর্মকে নানাভাবে বিদ্ধ করেছেন।এবং যেকোন অনুভবী গল্প পাঠকে ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম বলে আমার মনে হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১) দে মলয়কান্তি, 'আত্মপরিচয়', সানগ্রাফিক্স,শিলচর, প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ২০১৪, পৃ: ৬২

২) দে মলয়কান্তি, 'আত্মপরিচয়', সানগ্রাফিক্স,শিলচর, প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ২০১৪, পৃ:৬২

৩) দে মলয়কান্তি, 'আত্মপরিচয়', সানগ্রাফিক্স,শিলচর, প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ২০১৪, পৃ:৬২

৪) দে মলয়কান্তি, 'আত্মপরিচয়', সানগ্রাফিক্স,শিলচর, প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ২০১৪, পৃ:১২১

৫) দে মলয়কান্তি, 'আত্মপরিচয়', সানগ্রাফিক্স,শিলচর, প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ২০১৪, পৃ:১২৫

৬)দে মলয়কান্তি, 'আত্মপরিচয়', সানগ্রাফিক্স,শিলচর, প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ২০১৪, পৃ:১৫৫

৭)দে মলয়কান্তি, 'আত্মপরিচয়', সানগ্রাফিক্স,শিলচর, প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ২০১৪, পৃ:১৫৫